০১-০৩-১৮ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের যোগে এমন ভাবে থাকো যেন স্মরণ করতে করতেই কলিযুগের এই ঘোর-তমসাচ্ছন্ন রাত্রির অবসান হয়ে বাবার কাছে পৌঁছে যেতে পারো - তখনই আসবে প্রকৃত দিন। সত্যি কি আশ্চর্যের তোমাদের এই তীর্থ-যাত্রা"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, স্বর্গ-রাজ্যে যাওয়ার আকাঙ্খা কেন হয় তোমাদের ?

উত্তর :- যেহেতু তোমরা জানো যে, তোমরা আত্মারা যখন স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছবে, একমাত্র তখনই অন্য সব আত্মাদেরও কল্যাণ হবে। সেইসব আত্মারাও তখন নিজেদের ঘর শান্তিধামে পৌঁছতে পারবে। যদিও স্বর্গ-রাজ্যে যাবার জন্য বি.কে.-রা লালায়িত নয়। যেহেতু তোমরাই তো সেই স্বর্গ-রাজ্য স্থাপন করছো, যেখানে এত কষ্ট করে তোমরাই তা তৈরী করছো- তাই সেখানকার মালিকানা তো তোমাদেরই। এছাড়া তোমাদের অন্য কোনও ইচ্ছাই নেই। লোকেদের তো কত প্রকারেরই ইচ্ছা থাকে, ভগবানের সাথে সাক্ষ্যাতের প্রবল আগ্রহ থাকে তাদের, অথচ দেখো, সেই ভগবান স্বয়ং তোমাদেরকে পাঠদানে রত।

গীত :- ওহে নিশীথ রাতের যাত্রীরা .....

ওঁম্ শান্তি! গীতের এই "ওহে নিশীথ রাত্রির যাত্রীরা ... বাচ্চারা,এর অর্থ তো তোমরা নিশ্চয় বুঝেছো, যদিও তা বোধগম্য হয় তোমাদের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। তোমরা যদি তোমাদের স্ব-দর্শন চক্রকে ঘোরাতে থাকো এবং স্মৃতিতে তা থাকে, তবে অবশ্যই তা অনুভব করতে পারবে- দিন অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যের কতটা নিকটে পৌঁছেছো তোমরা। বাচ্চারা, তোমাদের তো তা বোঝানোই আছে- বেহদের এই রাত ও দিনের বিষয়টা। বেহদের রাত অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত। শাস্ত্রেও এর কত সুন্দর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শাস্ত্রে কিন্তু এমন বলা হয় না যে তা লক্ষ্মী-নারায়ণের রাত। না, আসলে তা ব্রহ্মার দিন ও ব্রহ্মার রাত এমনই বলা হয়। সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণ সেখানে থেকেই রাজ-কার্য পরিচালনা করেন। এদিকে সৃষ্টি চক্রকেও অবশ্যই তার নিজের ধারায় আবর্তিত হতে হয়। (দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্তের ধারায়) সেই হিসাবে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ভার প্রতিবারই ফিরে আসে সত্যযুগেই। চক্রের এই ধারা অনুযায়ী সেই একই ভাবে সত্যযুগের পর ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ-ও আসে চক্রের নিয়ম অনুসারেই। অতএব সত্যযুগেও তো সেই একই রাজা এসে তার রাজ্য-ভার গ্রহন করবেন। একমাত্র শিববাবাই এই বিশেষ জ্ঞান বি.কে.-দের শোনান ব্রহ্মার মাধ্যমে। যা কেবলমাত্র তোমরাই এই সৃষ্টি-চক্রের বিশেষ জ্ঞান পেয়ে থাকো, কোনও দেবতারাও তা পায় না। একমাত্র তোমাদের অর্থাৎ বি.কে. ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিতেই এই সৃষ্টি-চক্র আবর্তনের জ্ঞান আছে। তাই বলা হয় ব্রহ্মার আর ব্রহ্মাকুমারদের ও ব্রহ্মাকুমারীদের রাত। কিন্তু সেই তোমরাই এখন এগিয়ে চলেছো প্রকৃত দিনের দিশায়। সত্যযুগকে দিন আর কলিযুগকে রাত বলা হয়। তোমরা তো এটাও জানো যে, তোমাদের এই যাত্রা শুরু হয় কল্পের এই সঙ্গমযুগে, অর্থাৎ কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগ শুরুর মধ্যবর্তী বিশেষ সময়কালে। যদিও তোমাদের এই তীর্থ-যাত্রা শুরু হয়েছে কলিযুগে, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণ করা আছে সেই সত্যযুগই। তাই আত্মাতে অবশ্যই এই ধারণা ধারণ করতে হবে- পঞ্চভূতের এই নশ্বর শরীর ত্যাগ করে, আত্মাকে ফিরে যেতে হবে তার প্রকৃত পিতা পরমাত্মার কাছে। তোমাদের এই শরীরের অন্ত তখনই হবে, যখন তোমাদের লক্ষ্য পুরো হবে, অর্থাৎ

বাবা-যতক্ষণ না তোমাদেরকে এই যোগ-বিদ্যা শেখানো ও জ্ঞানের পাঠ সম্পূর্ণ করে পড়ানোও বন্ধ করে দেবেন - ততক্ষণ পর্যন্ত। বাচ্চারা, তোমরাও তো এই বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। এ ভাবেই স্মরণে থাকতে থাকতেই, রাতের যেমন অবসান হয়ে যাবে, ঠিক তেমনই তোমরাও বাবার কাছেও পৌঁছে যাবে, অর্থাৎ তখন তোমাদের দিন। এমনই সুন্দর চমকপ্রদ তোমাদের এই স্মরণের তীর্থযাত্রা। বাবা এই দিনের স্থাপনা করেন, তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীদের জন্য। আর সেই সুবর্ণ-দিন অর্থাৎ সত্যযুগ আগত প্রায়। যেহেতু এখনও তোমরা এই ঘোর অন্ধকার কলিযুগেই রয়েছো - তাই, এই সময়ে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করে যেতে হবে।

বাবা ওঁনার বি.কে. বাচ্চাদের আরও বোঝাচ্ছেন - সবাইকে তো মরতেই হবে। লোকেরা জানতে চায়, কখন তা হবে ? বিনাশ-পর্বই বা কখন হবে ? তোমরা বি.কে.-রা তো তোমাদের দিব্য-দৃষ্টি দ্বারা সেই বিনাশকে দেখেছো। আর আগামীতে এই চর্মচক্ষুতে অবশ্যই দেখতে পাবে সেই নতুন স্থাপনা। তোমরা যার সাক্ষ্যাতকার করে থাকো, উনিও (ব্রহ্মা) এই চর্ম চক্ষুততেই তা অবলোকন করেন। এই ব্রহ্মাই এসবের মুখ্য ভূমিকায়, তাই তো বলা হয় যে, ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিন। যিনি স্পষ্ট রূপে তা অবলোকন করেন সেই বিনাশ আর স্থাপনা। যাবতীয় সবকিছুই উনি দিব্য-দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, আর বাস্তবে অবশ্যই তাই ঘটবে। ভক্তি-মার্গেও যা কিছু ঘটে, ঘটনার পূর্বেই তার সাক্ষ্যাতকার হয়ে থাকে ওনার দিব্য-দৃষ্টি দ্বারা। তোমরাও তেমনি দিব্য-দৃষ্টিতে তা দেখতে পারো। তাই তো তোমাদেরও আর এই বিনাশী দুনিয়ার কোনও কিছুর প্রতিই কোনও ইচ্ছা বা মোহ জাগে না। পরমপিতা পরমাত্মার একটু দর্শণ পাবার জন্য জাগতিক সাধু-সন্ন্যাসীদের কত আগ্রহ থাকে। কিন্তু এখানে তো সেই পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদেরকে সামনে বসিয়ে স্বয়ং এই পাঠ পড়ান। ফলে তোমাদেরও ইচ্ছা জাগে সেই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হতে। বাচ্চারা, তোমরা এও জানো যে, তোমরা স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছোবার পরেই অন্য-সবার কল্যাণ সাধিত হতে পারে। তোমরা বি.কে.-রা এখন জানতে পেরেছো, অসীম বেহদের এই বাবা, যিনি মনুষ্য সৃষ্টি-জগতের রচয়িতা, যিনি বীজরূপ, একমাত্র উনিই কল্প-বৃক্ষের এই বিস্তারের আদি-মধ্য-অন্তের ঝাড়কে জানেন। তেমনি বি.কে.-রাও এমন বাবা ও বাবার আশীর্বাদী-বর্সার গুণকে জানে। যেমন আম-গাছের ঝাড়কে দেখে সবাই তার বৈশিষ্ট বলে দিতে পারে। বীজ থেকে প্রথমে যেমন দু-চারটি পাতা বেড়োয়, তারপর ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধি হতে হতে পরে তা বড় গাছে পরিণত হয়। কিন্তু সব কিছুর মূলই হলো বীজ। এ তো গেল জড়-বীজ কথা। আর এই চৈতন্য-বীজরূপী (বৃক্ষপতি) বাবা হলেন, মনুষ্য সৃষ্টির বীজ। তাই তো ওনাকে 'নলেজফুল' বা 'জ্ঞানের সাগর' বলা হয়।

বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, এটা তোমাদের একটা পাঠশালা। যেখানে এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়ানো হয়, আর তার সাথে সাথে তোমরা যোগ-বিদ্যারও অভ্যাস কর। এই বিশেষ বিদ্যার দ্বারাই তো তোমরা ভবিষ্যতের রাজকুমার/রাজকুমারী হও। কিন্তু তা ধারণ করার জন্য আত্মসুদ্ধির প্রয়োজন অবশ্যই। কারণ, এখন এই দুনিয়ায় সবাই যে অপবিত্র। কিন্তু অন্যদের যদি তা বলো যে, তোমরাও অপবিত্র বা পতিত, তা তারা অবশ্যই মানবে না। তারাই আবার বলে যে, কৃষ্ণপুরীতেও একে অপরকে দুঃখ-কষ্ট দিত, যেহেতু সেই সময়ে সেখানে কংস, রাবণ, ইত্যাদি এমন ধরণের লোকেরা ছিল। আবার যে একে অন্যকে সুখ দেয়, তাকে পবিত্র বলে। স্বর্গ-রাজ্যে কিন্তু কেউ-ই কারওকে কোনও প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেয় না। সেখানে তো বাঘে-গরুতে একই ঘাটে জল খায়। কেউ কারও দুঃখের কারণও হয় না। কিন্তু এসব কথার মর্মার্থ অন্যেরা তো বুঝবেই না। তারা যে যেমন শাস্ত্র

পড়ে, তাদের মন-বুদ্ধিতে তেমনই ধারণা জন্মায়। দেবতার পূজারীরা নিজেরাই নিজেদের কপাল চাপড়ায়। যেমন হিন্দুরা, দেব-দেবীর নিন্দা-গ্লানি-অমর্যদা করে নিজেরাই নিজেদের কপাল পোড়ায়। অথচ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজের প্রবর্তকদের কত গুণগান-মহিমা-স্তুতি করে। দেবতাদের নিন্দা করা অর্থাৎ হিন্দু-ধর্মেরই গ্লানি করা। গীতাতেও তা স্পষ্টরূপে বলা আছে -
"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
[অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।
. (শ্রীমদ্ভগবদগীতা:--- জ্ঞান-যোগ, চতুর্থ অধ্যায়।]
গীতা-শাস্ত্রেও স্পষ্ট রূপে ভারতের নামও নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই ভারতই যেমন চূড়ান্ত ভ্রষ্টে পরিণত হয়, তেমনি আবার এই ভারত-ই শ্রেষ্টও হয়। শ্রেষ্ঠর মধ্যে শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্মী-নারায়ণও এই ভারতেরই। ভ্রষ্ট মানুষেরা নতশিরে শ্রেষ্ট মানুষের সামনে মাথা ঠোকে। যদিও সাধু-সন্ন্যাসীরাও পবিত্র থাকে, তবুও কিন্তু ভগবানকে জানতে পারে না তারা। উপরন্তু তারা নিজেদেরকেই ভগবান বলে প্রচার করে। গুরু-গোঁষাইরাও তো পতিত। যেহেতু তারাও তো বিকারী কাজ-কর্ম করে। বিকারীদেরকেই পতিত বলা হয়। পতিতরাই পবিত্রদের নমস্কার করেন। তাই তারা সাধু-সন্ন্যাসীদের গুরু বানান, যদি তারা অন্ততঃ কিছুটাও পবিত্র হতে পারে। খুব কমই আছে আজকাল, যারা প্রকৃত সাধু-সন্ন্যাসী। আর তা হলেও বা কি, গুরু-গোঁষাই করলে কি আর তাতে কোনও প্রাপ্তি হবে ? যেখানে সে নিজেই অপবিত্র পতিত। কিন্তু নতুন ভক্ত-আত্মারা এলে, তাদের মহিমাও তো কিছুটা ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, কারও যদি পুত্র-সন্তানের প্রাপ্তি হয়, কারও কোনও ধন-সম্পদ প্রাপ্তি হলে, ভক্তরা খুব খুশী হয়ে যায়। আর এরকম কারও কিছু হতে দেখলে সবাই মিলে গুরু-গুরু করতে থাকে। বাস্তবে গুরু কিন্তু করা উচিত সদগতি প্রাপ্তির জন্য। আর সেই গুরুকে অবশ্যই হতে হবে, যিনি ৫-বিকারকে ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছে। তা না হলে তেমন ব্যক্তিকে গুরু বানিয়ে গৃহস্থদের কি বা লাভ হবে ? এমন অনেক বড়-বড় গৃহস্থী-গুরু আছে, যদের হাজার-হাজার অনুগামী আছে। আবার কেউ একজন একবার গুরু হতে পারলে, পরম্পরায় ওনার মনোনীত ব্যাক্তিই সেই আসনের অধিকারী হয়। শিষ্যরা তো গুরুর চরণ-ধোয়া জলও পান করে, যা একেবারেই অবুঝের মতন অন্ধ-শ্রদ্ধা। যদিও মানুষেরাই এমন বলে যে, "হে ভগবান, তুমি তো অন্ধের যষ্টি!" কিন্তু তার অর্থ এমনটা করা উচিত নয় মোটেই। এই অন্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিহীন এমনটা বানায় মায়া-রাবণ। ফলে সবাই পাথরের মতন নির্বোধ হয়ে যায়। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে সতর্ক করে বলেন - বাচ্চাদের কাছে উনি আসেনই সর্ব শাস্ত্রের আদি অর্থাৎ সার শোনাবার জন্য। উদাহরণ স্বরূপ তিনি নারদের কথা জানান - "নারায়ণ নারদকে বলেছিলেন, তুমি যখন লক্ষ্মীকে বিয়ে করতে এতই আসক্ত, তবে তার আগে আয়নায় তুমি তোমার মুখ-মণ্ডলকে দেখে নিজেই বিচার কর, লক্ষ্মীর উপযুক্ত মনে হয় কি নিজেকে ?" এছাড়া লক্ষ্মীর নিবাস তো স্বর্গ-রাজ্যে। তোমরা নিজেরা এখন তা খুব ভালই জানো, তোমরা যা পুরুষার্থ করছো তার দ্বারাই তোমরা নিজেদেরকে বুঝতে পারবে, ভবিষ্যতের লক্ষ্মী বা নারায়ণের সাথে বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠতে পারছো কি না! আর তার নমুনা এখানেই বুঝতে পারবে। অনেকেই এমন আছে, চেহারায় যদিও তারা মানুষ, কিন্তু চাল-চলন, চরিত্র যেন অসভ্য বাঁদরের মতন। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন - "তোমরাও নিজেদের সেগুলিকে নিজেরাই বিচার করে দেখ, তা না হলে, হয়ত লোকেরাই তোমাদের বলবে, কি করে তোমরা এমন আশা করতে পারো যে তোমরাই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হতে চলেছো ? তখন তাদেরকে বোঝাতে হবে- আরে আমরাই

তো সম্পূর্ণ সৃষ্টি-জগতকে স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত করি। আমরা নিজেরা যেখানে এত কষ্ট করে দুনিয়াকে নতুন করে গড়ে তুলি, সেখানকার মালিক তো আমরাই হবো, কেউ না কেউ তো রাজত্ব করবেই সেখানে। - তাই না ?

বাবা তো বার বার বোঝাতে থাকেন, মানুষের প্রধান শত্রু হলো কাম-বিকার। আর এর কারণেই মানুষেরা আদি-মধ্য-অন্তে দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকে। কাম-বিকারই অর্দ্ধেক কল্পের সবচেয়ে প্রধান শত্রু। যদিও অবিনাশী এই বিশ্ব-নাটকের চিত্রপটে সুখ ও দুঃখ উভয়েই আছে। কিন্তু সুখের জীবন থেকে দুঃখের জীবনে নিয়ে যাবারও তো কেউ না কেউ থাকে। আর সে হলো 'রাবণ'! অর্দ্ধেক-কল্প এই রাবণেরই রাজত্ব চলে। বাচ্চারা, এসব কথা কেবল তোমরাই জানো। কিন্তু এই জানাটাও তোমাদের জ্ঞানের-মাত্রার ক্রমিক অনুসারে। ভেবে দেখ, লোকেরা বলে যে, কৈলাশ পর্বতে শংকর-পার্বতীর বাস। এমন কি সেখানে রাষ্ট্রপতির মতন ব্যক্তিত্বরাও অমরনাথ, কৈলাস-পর্বত ইত্যাদি জায়গায় যায়। তবুও কিন্তু তারাও এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারে না যে, শংকর-পার্বতী সেখানে আসবেই বা কি প্রকারে ? আচ্ছা, পার্বতীর কি এতই দুর্গতি হয়েছিল যে, শংকর সেখানে বসে তাকে অমরকথা শোনাবে ? তাদের স্থান তো সূক্ষ্ম-বতনে। যেখানে দুর্গতির কোনও প্রশ্নই নেই। ভক্তি-মার্গের লোকেরা কত দূর-দূরান্তে যায় কেবল ঠেলা-ধাক্কা আর হোঁচট খেতে। এরই নাম ভক্তি-মার্গ। এখানে দুঃখ-কষ্ট পেতে হয় সকলকেই। যে যতই ভক্তি কর না কেন, তার প্রাপ্তি তো অল্প সময়ের জন্য। আর কি সেই প্রাপ্তি ? - যতক্ষণ তীর্থ-ভ্রমনে থাকবে, ততক্ষণ পবিত্র থাকার আনন্দ। কিন্তু তাতে আবার এমনও আছে, যেমন কোনও মাদকাসক্ত ব্যক্তি মদের নেশা ছাড়া থাকতেই পারে না। সে তো লুকিয়ে হলেও মদের বোতল নিয়ে যাবে সাথে করে। তারপরেও কি একে তীর্থ-যাত্রা বলা চলে ? এ রকমের কতই না নোংরামো আছে ভক্তি-মার্গে, যা বলার কথা নয়। তীর্থস্থানগুলিতেই আবার কত প্রকারের বিকারের ব্যবস্থা থাকে, যা সহজ লভ্যও বটে। যেহেতু এইসব মানুষদের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, তাই তারা ভাবে এই ভক্তি-মার্গ কতই না ভাল এবং এই দিশাতেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। ফলে এই ভক্তির কারণে অর্দ্ধেক কল্প ধরে তারা কেবল ধাক্কাই খেতে থাকে। আর ভক্তি-মার্গের এই অর্দ্ধ-কল্প যখন শেষ হয়, একমাত্র তখনই ভগবান স্বয়ং আসেন ধরাতে, পরমাত্মা বাবা আসেন তার আত্মাধারী বাচ্চাদের ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করাতে। কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে, ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া গেল। আর তাই যদি হতো, তবে তো ভগবানর প্রতি এত কাতর প্রার্থনা করে ওনাকে ডাকার প্রয়োজনই বা কি থাকতো ? তবে তারা ভগবানকে এত স্মরণই বা কেন করবে ? আসলে তাদের এই ধারণাটাই নেই, ভগবানকে ঠিক কখন পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, ভক্তির ফল হিসাবে কৃষ্ণের সাক্ষ্যাৎকার হতে পারে, ব্যস্ এটুকুই যা। তাতেই তারা ভেবে নেয় ভগবানকে পেয়ে গেছে। নিজেদেরকে বৈকুন্ঠবাসী ভেবে খুব আনন্দও পায়। তারা ভাবে যে, কৃষ্ণ-দর্শণ যখন হয়েছে, তবে তো সেই কৃষ্ণ-পুরীতেই রয়েছে তারা। কিন্তু বাস্তবে কি তারা কৃষ্ণ-পুরীতে যেতে পারে ? - অবশ্যই না। আসলে ভক্তি-মার্গে এমন অনেক প্রকারের অন্ধ-শ্রদ্ধা রয়েছে। বাচ্চারা, এসব বিষয়ে তোমরা এখন যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও বুঝদার হয়েছো। বাবা কোনও এক বিশেষ সাধারণের শরীরকে আধার করেন বলেই তো ওনাকে এত নিন্দা-গালি-গালাজ শুনতে হয়। তবে ঐ বিশেষ শরীরকে আধার না করলে, আর কার শরীরকেই বা আধার বানাবেন ? কৃষ্ণের শরীরকে আধার করে তো আর গালি-গালাজ শোনা যায় না। উপরন্তু এই পতিত দুনিয়ায় কৃষ্ণের আত্মাকে পবিত্র বানাতেই তো ওনার এই আগমন। যেহেতু কৃষ্ণ পতিত থাকলে সেই পবিত্র দুনিয়ায় প্রবেশই করতে পারবে না যে। এছাড়া কৃষ্ণকে তো কেউ-ই পতিত-পাবনও বলে না। লোকেরা তো একথাও বোঝে না যে, প্রকৃত পতিত-

পাবন কে। উনি আসেনই বা কি পদ্ধতিতে। তাই তাদের মধ্যে সেই বিশ্বাসও আসে না সেভাবে। আর শাস্ত্রগুলিতেও তা লেখা নেই, নিরাকারী পরমাত্মা শিববাবা কি প্রকারে ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে তাকে আধার বানায়। তবে তারা কিন্তু একথাও বলে, ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাই সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপনা হয়। কিন্তু তারাই আবার তা ভুলে যায়, কখন-কিভাবে তা হয়ে থাকে। সেই হিসাব মতো, প্রজাপিতা ব্রহ্মারও উপস্থিতি অবশ্যই থাকবে কল্পের এই সঙ্গম সময়েই। তবেই তো ব্রাহ্মণদের দ্বারা নতুন সৃষ্টির রচনা হবে। অথচ মানুষেরা একেবারেই বিভ্রান্ত হয়ে আছে। এখম তোমরাই তাদেরকে সেই সঠিক দিশা দেখাবে। যেখানে বাবা স্বয়ং কত বিশাল কর্ম-কর্তব্যের সেবা করে চলেছেন। এখন তোমরা তা অনুধাবন করতে পারছো। এতদিন ধরে তোমরা এই ৫-বিকারের বশে একদম অসভ্য বাঁদরের মতন স্বভাবের হয়ে গেছিলে। অথচ, তোমরা বি.কে.-রাই একদা দেব-দেবী ছিলে, আর আজ - যা একেবারেই বলার মতন নয়। তাই তো বাবা এসেছেন, সেই তোমাদেরকেই আবার উন্নত থেকে উন্নততর করে গড়ে তুলতে। অতএব এমন বাবার প্রতি কত অধিক প্রেম থাকা উচিত। এসব কিছু তোমাদের কে শোনাচ্ছেন - বাবা না কি দাদা ? অনেক বাচ্চাই তা জানে না। তাই বাবা বলছেন- তা ভেবে দেখ, আমার পক্ষে কি তা সম্ভব, সর্বদাই এই শরীররূপী (ব্রহ্মার) রথে অবস্থান করা ? তা তো আর সম্ভব নয়। আমি তো আসি কেবলমাত্র আমার কর্ম-কর্তব্য পালন ও বাচ্চাদের সেবা করতে।

বাবার কাছে খবর এসেছে- কেউ একজন জানতে চেয়েছে, এটা কি সম্ভব যে, কোনও মানুষ অন্য কোনও মানুষকে সুখ দিতে পারে কি না ? সুখ দেওয়াটা কি মানুষের হাতে ? তখন সেই প্রশ্নকারীকে উত্তর দিয়েছে- না, তা সম্ভব নয়। একমাত্র ঈশ্বরই মানুষদের সেই সুখ প্রদান করতে পারেন। এ ব্যাপারে মনুষ্যের হাতে কোনও ক্ষমতাই নেই। তখন কোনও একজন (বি.কে.) তাকে বোঝালেন, মানুষ-ই মানুষকে সুখ দিতে পারে। মানুষই সবকিছুই করে থাকে। বরঞ্চ ঈশ্বরের হাতেই কিছু নেই। তখন বাবা তাকে জানান, আরে, কাকে কি দেবার ক্ষমতা আছে তোমার ? জাগতিক সবকিছুই তো ঈশ্বরের হাতেই। বরং তাকে বোঝানো উচিত - সবাইকে শ্রীমৎ অনুসারেই চলা উচিত। পরমপিতার শ্রীমৎ ছাড়া কেউ কারওকে কোনও প্রকারের সুখ দিতেই পারে না। নিজের বড়াই করা উচিত নয়। এই শ্রীমৎ অনুসারেই তোমরা সমগ্র সৃষ্টি-জগতকে স্বর্গ-রাজ্য বানাও। এটাই বোঝার যে, কত বড় ভুল বাচ্চাদের দ্বারাও হয়ে যায়। যেখানে জাগতিক লোকেরা বলছে এসব কিছু ঈশ্বরেরই হাতে, সেখানে বি.কে. হয়েও সে বলছে তা মানুষের হাতেই আছে। বাস্তবে, এ ক্ষমতা তো কেবলমাত্র বাবার হাতেই। বাবার শ্রীমৎ ছাড়া কেউ কিছু করতেই পারে না। এ ব্যাপারে মানুষ কানাকড়ি শূণ্য কপর্দকহীন। বাবা আরও জানাচ্ছেন, "রাবণ মানুষদেরকে একেবারে পাথরের মতন নির্বোধ বানিয়ে ফেলে। এমত অবস্থায় আমি এসে তোমাদেরকে পরশ-পাথরের মতন দৈবীগুণী ও বুদ্ধিমান বানাই। অতএব যা কিছু মহিমা করবে, তা সবই একমাত্র এই বাবারই।" আমরা যেন কেবলমাত্র শ্রীমত অনুসারেই চলি। যেহেতু ঈশ্বর বিনা কোনও মনুষ্যই কারওকে শ্রেষ্ট বানাতে পারে না। আচ্ছা -

ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুল-ভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যে বাবা আমাদেরকে এত সেবা যত্ন করে দেবতার মতন উন্নত বানাচ্ছেন, এমন বাবার প্রতি বাচ্চাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রকৃত ভালবাসা অবশ্যই রাখতে হয়। দেবতার মতনই সবাইকে সুখ দিতে হবে।

২) সর্বদাই এক ও একমাত্র এই বাবারই মহিমা করতে হবে। কখনও নিজের বড়াই করবে না।

বরদান :- সদা যথার্থ শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা সফলতার ফল প্রাপ্ত করতে পারা জ্ঞানী ও যোগী আত্মা হও

বিস্তার :- যে জ্ঞানী আর যোগী আত্মা হয়, তার প্রতিটি কর্মই স্বতঃস্ফূর্ত ও যুক্তিযুক্ত হয়। যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ সদা যথার্থ শ্রেষ্ঠ কর্ম। তখন যে কোনও কর্মের বীজ হোক, তা বিনা ফলে বিফলে যায় না। যে যুক্তিযুক্ত হয়, যে কোনও সময়ে, যে কোনও সংকল্পে, বাণী কিম্বা কর্মতে সে তা করতে পারে। তার সেই সংকল্পও হবে যুক্তিযুক্ত। এমনটা করা উচিত হবে না, যদিও আমি তা করতে চাইনি, কিন্তু হয়ে গেল। এমনটা ভাবতে চাইনি, তবুও তা ভাবলাম। রাজযুক্ত(সকল রহস্য যার জ্ঞাত), যোগযুক্তের লক্ষণই হল - যুক্তিযুক্ত।

স্লোগান :- যার হৃদয় বড়, তার ভাণ্ডার সদাই ভরপুর (পূর্ণ) থাকে।